জলে কুমির ডাঙায় বাঘ

এই তো এক সপ্তাহ আগেও পড়েছিলাম, 'সংকট উত্তরণের শেষ উপায় সংলাপ'। আমি লিখেছিলাম, 'সংকট উত্তরণের শেষ উপায় শুভবুদ্ধির উদয়'। আমি জানি, সংলাপ হলেই সংকট উত্তরণ হয় না। 'মনে যারে চায় রে বন্ধু, দিলে যারে চায়, তারে কি ভুলিতে পারি পরের কথায়।' মনে এক, বাইরে আরেক। জেগে ঘুমানো লোককে তো জাগানো কঠিন। 'খলেরও ছলের অভাব হয় না।' এ-কথা দেশীয় রাজনীতির সব দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোনো বড় দল যদি তাদের লাভালাভের কথা বাদ দিয়ে দেশের কল্যাণের কথাকে ভেবে কাজ করতো, তাহলে এত সংঘাতময় পরিস্থিতিরই তো উদ্ভব হয় না। আমরা জাতীয় নির্বাচনে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে কোনোভাবে যদি একটা নিজস্ব কূল খুঁজে পেতে চাইলে, ক্ষমতাসীন দল যেদিকে যাচ্ছে, তা ঠিক আছে। কারণ তারা তো নিজের ইচ্ছাকেই শুধু গুরুত্ব দিচ্ছে। আমি তাদের রাজনীতির কৌশলের তারিফ করি, দোষ দিতে চাইনে। যদি কোনো দল মনে করে, অতশত বুঝিনে, যে কোনোভাবে আমাদের আরো পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার লাইসেন্স নবায়ন চাই, তখন তারা যা করছে এর বিকল্প নেই। তখন সংকট সমাধানেরও প্রয়োজন নেই, তাই সংলাপেরও দরকার নেই। সে কথা তারা প্রকাশ্যেও বলছে। সেক্ষেত্রে দেশের পরিস্থিতি কেমন হবে, সচেতন মানুষ মাত্রই তা বোঝেন।

আমাদের পাশের গ্রামের একজন তুতলিয়ে কথা বলতো। কেউ যদি তাকে জিজ্ঞেস করতো, কোথায় যাবে গো বাপু শুণি? সে পু-পু-পু করলেই সবাই বুঝে নিত আর বলতো, 'কষ্ট করে আর বলা লাগবে না, তুমি পুটিমারি গ্রামে যেতে চাও, এই তো? সে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানাতো। আমরাও মাথা নাড়ি, কিন্তু মতলবটা খুলে বলিনে। সবাই বুঝলেও 'মুখে মধু পেটে বিষ' থাকায় অসম্মতি জানাই। এখানেই সমস্যা। আসলে এক যাত্রায় দুই ফল হতে পারে না। কেউ শ্যামও রাখবে, আবার কূলও রাখবে– এটা হয় না, হতে পারে না। লালন গেয়েছিলেন, 'হাতের কাছে হয় না খবর, কি দেখতে চাও দিল্লী শহর, সিরাজ সাঁই কয় লালন রে তোর সদাই মনের ঘোর গেল না।' স্বাধীনতার পর থেকেই এদেশের সাধারণ মানুষের মনে দিনে দিনে যে ঘোর পাকিয়েছে, তার গভীরতা অনেক বেশি। এ ঘোর সহজে যাবে না। এ ঘোর রাজনীতিকরা তাদের অপকর্ম দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আমরা অনর্থক দিল্লী কিংবা ওয়াশিংটনকে দোষারোপ করে নিজেদেরকে ধোয়া তুলসীপাতা বলে দাবি করি। এটা অযৌক্তিক। লালন আরো গেয়েছিলেন, 'আপন ঘরের খবর লে না।' আমরা আপন ভুলে পরকে তোষামোদ করে বেড়াই। রাজনীতির উদ্দেশ্যের পথ ভুলে দলীয় গোপন মনবাঞ্ছা পূরণে মত্ত হয়ে পড়ি। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে তো ওয়াশিংটন দিল্লীর উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। এবার দিচ্ছে না কেন? নিয়মটা হয়েছে এরকম– এদেশে ক্ষমতার মসনদে বসতে গেলে জনরায়ের আর প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় পার্শ্ববর্তী শক্তি ও পরাশক্তির আশির্বাদ। কথাটা আমাদের মনে গেঁথে গেছে। তাই আপনকে বাদ দিয়ে দিল্লি-ওয়াশিংটন ঘুরে বেড়াচ্ছি। দিল্লিরও উচিত কোনো নির্দিষ্ট দলকে অন্ধের মতো সাপোর্ট না করে এদেশের মানুষকে ভালোবাসা। তাদের দেশে গণতন্ত্র চাইলে এদেশের গণতন্ত্রেও বিশ্বাস করা। তাতে তারা ভালো থাকতে পারবে। আমার এ সোজাসাপটা কথায় আবার খালু বেজার হবার ঢের সম্ভাবনা।

ছোটবেলায় আমরা সবাই পড়েছি কুমির আর শিয়ালের ভাগাভাগির চাষবাসের গল্প। প্রথমবার আলু চাষ করতে গিয়ে শিয়াল কুমিরকে উপরের অংশ দেবে বলে কথা দিয়েছিল, করেছিলও তাই। কুমিরের অসন্তুষ্টি দেখে দ্বিতীয়বার শিয়াল নীচের অংশও দিতে চেয়েছিল। কুমির খুব আশা করে নীচের অংশ নিয়েছিল। দ্বিতীয়বার চাষ করেছিল আখ। কুমির যত চেষ্টাই করুক ফসল ঘরে তুলতে, বুদ্ধিটা তো করে শিয়াল। অবস্থা ভেদে বুদ্ধি বদলায়। কুমিরের কি শিয়ালের উপর আস্থা রাখা উচিত? কোনোক্রমেই না। তৃতীয় পক্ষ লাগবেই। যা উভয়ের জন্যই ভালো। রাজনীতিতে কেউ কথা রাখে না। ছিয়ানব্বইয়ের আগে মাগুরা উপনির্বাচনে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে পাশ করার চেষ্টা বিএনপি-র জন্য কাল

হয়েছিল। একানব্বই-এ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বচনে ক্ষমতায় এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভুলে গিয়ে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের জেদ ধরা কি বিএনপির জন্য সঠিক হয়েছিল? খেসারত বিএনপিকেই দিতে হয়েছিল। এখনো দিতে হচ্ছে। আবার একানব্বইয়ের মেয়াদে বিএনপি যতটা ভালোভাবে দেশ চালিয়েছিল, সে তুলনায় ২০০১ এ দেশচালনায় তাদের ব্যর্থতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি এদেশের সচেতন মানুষের চোখে ধরা পড়েছিল। বর্তমান ক্ষমতাসীনদেরও তাই। '৯৬ থেকে ২০০১ মেয়াদের দেশ পরিচালনার তুলনায় ২০০৮ সাল থেকে দেশ পরিচালনায় অনেক ফারাক। পরিচালনার নীতিতে বেজায় ঘাটতি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিতে ভরা। এদেশের রাজনীতিকদের দেশের প্রতি কতটা দরদ, নিজের কোলে ঝোল টানা, দলবাজি করা, স্বজনপ্রীতি করা– এসব সাধারণ মানুষের না-বোঝর কথা নয়। এদেশের স্বাধীনতা অর্জনে আওয়ামী লীগ বড় ভূমিকা রেখেছিল, কোনো শত্রুও তা অস্বীকার করবে না। দেশের মানুষের জন্যই যদি স্বাধীনতা, তবে স্বাধীনতার কেন আজ এ দশা! এতই যদি করলে, তবে আবার উদ্দেশ্যচ্যুত হওয়া কেন? একটা গানের অন্তরাটা এরকম–'ভুল করে তুই বারে বারে করিস কেন ভুল, গলায় মালা পরলি যদি ছিঁড়িস কেন ফুল, ও তুই ছিঁড়িস কেন ফুল।' বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল যদি জোর করে নির্বাচন একটা করেও ফেলে, তা হবে আবারো ভুল। দেশের জন্য তা হবে লেজেগোবরে অবস্থা। তা হবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্তমান সময়ের চেয়েও দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি ও অশান্তির সূচনা। এতে শুধু ভারতের ওপর নির্ভর করে বিশ্বসমাজ বাদ দেওয়া আদৌ ঠিক হবে না। এজন্য 'পীরিতে মজেছে মন. কী-বা মুচি, কী-বা ডোম' অন্ধের মতো অনুসরণ না করে সুপথে আসাটাই রাজনৈতিক দলের স্বার্থ হাসিল হোক না-হোক দেশের জন্য ভালো। তাই ক্ষমতাসীন জোট ও বিপক্ষীয় জোটের শুভবুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ মানুষের শান্তি ও মুক্তি নেই। যে মানসিকতার অভাবে সেই একানব্বই সাল থেকে আজ পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে এদেশ ভুগছে। এর মূল যে এদেশের জনসাধারণের রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থার অভাব এটা বুঝতে আমরা ভুল করি। আমরা খুব গভীরভাবে লক্ষ করছি, ক্ষমতাসীন জোট ও বিপক্ষীয় জোট উভয় জোটেরই লোকজন ক্ষমতার ও স্বার্থ হাসিলের জন্য যারপরনাই মজনুন হয়ে গেছে। কারণ দেশ লুটপাট ও ক্ষমতা খাটানোর একমাত্র সুযোগ হয়ে উঠেছে রাজনীতির পেশা ও রাজনৈতিক আনুগত্য। তাই নির্বাচনে জিততে এত আগ্রহ। পদপ্রার্থী হতে প্রতিটা ফরম পেতে গোপনে কত লেনদেন করতে হচ্ছে, আল্লাহ মালুম। পদে গিয়ে এ খরচের অন্তত একশ গুণ তো এদেশ থেকেই আদায় করতে হবে, সাথে ক্ষমতা। এই এক রোগেই তো দেশের বারোটা বেজে যাচ্ছে এবং দিন যত সামনে এগোচ্ছে রোগের প্রকোপ বাড়ছে। দেশ ধরাশায়ী হয়ে যাচ্ছে।

বিএনপি জোট যদি নির্বাচনে না আসে তখন ক্ষমতাসীন জোট আসলেই সুষ্ঠু নির্বাচন করবে। তারা তো বিভিন্ন বক্তৃতায় বলছে, এদেশের সত্তরভাগ ভোটার তাদের। সত্তরভাগের মধ্যে অন্তত দশ ভাগ ভোট দিতে এলেও তো তাদেরই জয়। বাকি ভোটার কেন আসেনি, এর একটা সদুত্তর তারা হয়তো প্রস্তুত করে রেখেছে। নিজেদের লোক নিয়ে আসন ভাগাভাগির সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। আসন ভাগাভাগি কাদের সাথে করবে, তাও ইতোমধ্যে গোছানো শেষ। ভাত ছিটালে কাকের যেমন অভাব হয় না, ক্ষমতা ও লাভ ছিটালে পদান্বেষী 'খাঁটি বাঙালি' খুঁজে পাওয়া অনেক সহজ। ক্ষমতাসীন দল সে সুযোগ নিচ্ছে ও ভবিষ্যতে আরোও নেবে। এ অবস্থায় বিএনপি জোট নির্বাচনে এলে ক্ষমতাসীন জোটের 'সুষ্ঠু নির্বাচন' বুদ্ধি কিন্তু উল্টে যেতে এক দিনও সময় লাগবে না। ভোট শুরু হয় ছয় মাস আগ থেকে। তারা কিন্তু মাঠ প্রশাসন নিজেদের মতো করে আগেই সাজিয়ে রেখেছে।

সামাজিক অবক্ষয় দেখলে বোঝা যায়, স্বাধীনতার সময় বাঙালির যে একনিষ্ঠতা ও দেশের জন্য ত্যাগ ছিল; সে অবস্থান থেকে বাঙালি অকল্পনীয় দূরে স্থান করে নিয়েছে। এগুলো আমাদের দেশ গড়ার ব্যর্থতা। আমরা মানুষ দিয়ে দেশ ভরে ফেলি কিন্তু মানবসম্পদের স্বল্পতায় ভুগি। আমাদের দেশের ভোগবাদী সমাজও আমার এসব কথার পাত্তা

দেয় না। আপনাদের অনেকেই আমার সাথে নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, রাজনীতি এদেশে এখন আর কোনো 'নীতি' নয়, নয় দেশসেবা, সমাজসেবা; সত্য হচ্ছে বর্তমান যুগে রাজনীতি একটা যৌথ প্রচেষ্টা, কৌশল, লাভজনক মিথ্যা বলা এবং টাকা হাতিয়ে নেওয়ার ব্যবসা। কোনো দলই একথাটা বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতে পারবে না। প্রতিদিনের পত্রিকা দেখলে আর চোখ-কান খোলা রেখে পথ চললে প্রমাণের অভাব হয় না। এদেশে নীতি-আদর্শের রাজনীতি করতে হলে, দেশ গড়ার ইচ্ছে থাকলে মানুষ মঙ্গল গ্রহ থেকে আনতে হবে, অথবা বসবাসরত মানুষদের আগে শিক্ষা ও পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে হতে হবে শিক্ষা সংগঠন। এর কোনো বিকল্প তো আমি দেখিনে। তাছাড়া ভোঁদড়কে মাছ পাহারা দিতে দিয়ে কোনো ভালো ফল পাওয়া যাবে না, যাকে আমরা অরণ্যে রোদন বলি।

আমরা তো কোনো কলকারখানা, পুরোনো দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, কোনো সিস্টেম বারবার খারাপ হতে থাকলে, আশানুরূপভাবে কাজে লাগাতে না পারলে রিনোভেশন (নবরূপদান, পুনঃসংস্কার, নবীকরণ, পুনরায় নতুন) উপযুক্ত সমাধান বলে ভাবি। ভালো ও মনমতো ফল দেয় না বলেই এগুলো করি। এদেশের যথাযোগ্য ব্যক্তিদের মাথায় কখনো 'পলিটিক্যাল রিনোভেশনের' কথা এলেই আমাকে খোঁজ দিতে ভুলবেন না। আমি এই শেষ বয়সেও হতে চাই অগ্রপথিক। এদেশে এর কোনো বিকল্প নেই। এদেশে নীতিহীন, প্রতারক, আত্মপ্রবঞ্চক, যুযোগসন্ধানীদের পোয়াবারো। যত অসুবিধা সাধারণ ছা-পোষা সাধারণ মানুষ নিয়ে। তারা অনন্যোপায়, নিম্ন আয়ের লোকজন। যাবার কোনো জায়গা নেই। ভাত জোটাতেই গলদঘর্ম– বিদেশে টাকা পাচার করবে কীভাবে? বেগমপাড়াই-বা গড়বে কীভাবে? রাজনৈতিক অনৈক্য, হানাহানি, মারামারি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, প্রতিটি পদে প্রতারণা এদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেছে। আর কত! প্রকৃতিপ্রদত্ত কোনো গজব তো এদের নেই বললেই চলে। সবই রাজনীতিবিদের মগজ-সৃষ্ট। তাই বিধাতাকেও তো এরা দোষারোপ করতে পারে না। এদের চিহ্নিত প্রকাশ্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এদেশের রাজনীতিবিদ। বিলাপ করেও এ বিপদের মুক্তি নেই। শুধুই দীর্ঘশ্বাস। যত আপদ-বিপদ, জীবন-সংহারক উপাদান এই বিকৃত ও জীবনঘাতি রাজনীতি। এই কুলনাশা রাজনীতি এদেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ও যুব-সম্প্রদায়কেও ধ্বংস করে ছাড়ছে। লেখাপড়া শিঁকেয় উঠেছে। মাস্টার-মানুষ হওয়াতে এদেশের ছাত্রছাত্রী ও যুব-সম্প্রদায়ের হাজার হাজার ধ্বংসলীলা নিজ চোখে দেখছি।

আশির দশকে সাগরের বিক্ষুব্ধ জলরাশি, প্রবল জলোচ্ছ্বাস-ঘর্ণিঝড় এদেশের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হেনেছিল। রাতের অন্ধকারে গবাদিপশু, ঘরবাড়ি, মানুষজনকে উড়িয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় যে ফেলেছিল, তার কোনো ইয়ত্তা ছিল না। অনেক পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একটা পরিবারের এক পঞ্চাশোর্ধ্ব বিধবা মহিলা বাদে সে পরিবারের আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। পরদিন সকালে অগণিত মৃত গবাদিপশু ও লাশ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে ভেসে কিনারে আসছে। সেই পঞ্চাশোর্ধ্ব বিধবা সাগর-কূলে হাঁটু পানিতে নেমে হাঁটু গেঁড়ে বসে দু-হাত একবার পানিতে থাবড়াচ্ছে আর একবার নিজের বুক চাপড়াচ্ছে। বিলাপ ধ্বনীতে অনবরত বলে চলেছে, 'রাইক্ষসী দইরার হানি তুই আঁরে আর কত কান্দাইবি।' এদেশের রাজনীতির কদাকার ও বিভৎস রূপ দেখলেই অতীতের সেই মহিলার গগনবিদারী বিলাপের ছবি স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। কেউ বলতে পারেন, এ থেকে নিস্তারের উপায় কি?

(২৮ নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ